মান্ডুর রূপমতী

বুদ্ধদেব গুহ

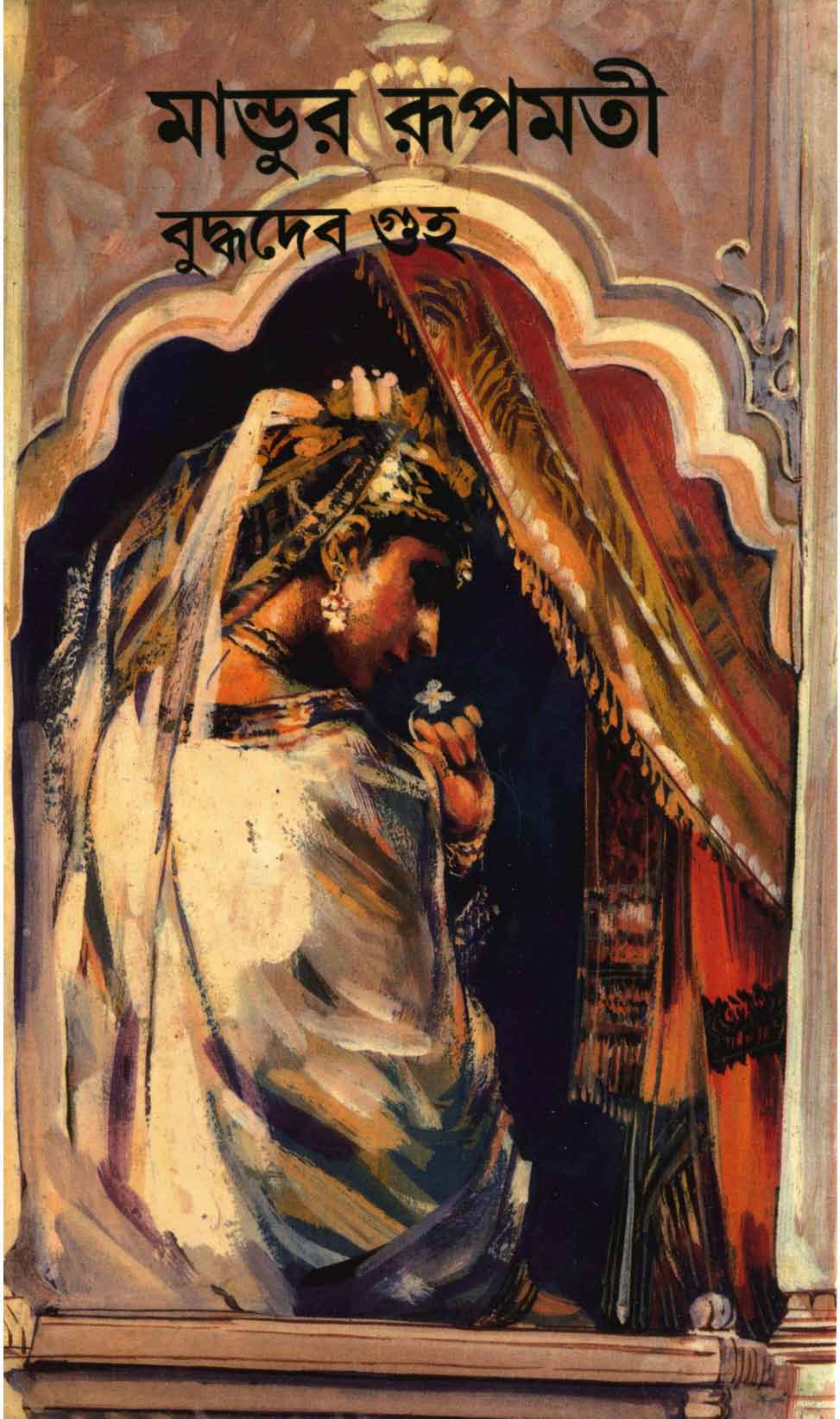

মাণ্ডুর রূপমতী

বুদ্ধদেব গুহ

সাহিত্যম্ ॥ ১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলকাতা - ৭৩

MANDUR RUPMATI
by Buddhadev Guha
Published by Sahityam
18B Shyamacharan Dey Street
Calcutta 73
Rs. 20.00
ISBN-81-7267-044-3

প্রথম সাহিত্যম্ সংস্করণ
কলিকাতা পুস্তকমেলা, ১৯৯৬
মাঘ ১৪০২

দ্বিতীয় মুদ্রণ
অগ্রহায়ণ ১৪০৭

মুদ্রণ সংখ্যা ২২০০

প্রকাশক ঃ
নির্মলকুমার সাহা
সাহিত্যম্
১৮বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রাপ্তিস্থান ঃ
নির্মল বুক এজেন্সী
৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড কলকাতা ৭০০ ০০৭

প্রচ্ছদ ঃ
সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়
অলংকরণ ঃ
সুব্রত চৌধুরী

বর্ণ-সংস্থাপন ঃ
লেজার অ্যান্ড গ্রাফিক্স
১৫৭বি মসজিদবাড়ি স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০০৬

মুদ্রক ঃ
লোকনাথ বাইন্ডিং অ্যান্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২৪বি কলেজ রো
কলকাতা ৭০০ ০০৯

দাম ঃ ২০.০০

এডি এবং তিতলিকে

লেখকের অন্যান্য বই

জগমগি

বাসনাকুসুম

বাবলি
মাধুকরী
ঋভুর শ্রাবণ
বাজা তোরা, রাজা যায়
ধুলোবালি
মহড়া
পারিধী
সোপর্দ
চবুতরা
স্বগতোক্তি
প্রথম প্রবাস
প্রথমাদের জন্য
লবঙ্গীর জঙ্গলে
জলছবি, অনুমতির জন্যে
আয়নার সামনে
বুদ্ধদেব গুহর শ্রেষ্ঠ গল্প
দূরের দুপুর
দূরের ভোর
জঙ্গল মহল
সুখের কাছে
জঙ্গলের জার্নাল
যাওয়া-আসা
ঝাঁকি দর্শন
রিয়া
কোয়েলের কাছে
একটু উষ্ণতার জন্যে
বিন্যাস
দু নম্বর
অ্যালবিনো
বাতিঘর
মহুলসুখার চিঠি
টাঁড়বাঘোয়া
গুগুনোগুম্বারের দেশে

বাংরিপোসির দু'রাত্তির
মউলির রাত
ঋজুদা সমগ্র (১ম, ২য়)
ওয়াইকিকি
বনবিবির বনে
হলুদ বসন্ত
নাজাই
পলাশতলীর পড়শি
ভোরের আগে
নগ্ন নির্জন
খেলা যখন
মহুয়ার চিঠি
শালডুংরি
সন্ধের পরে
সাসানডিরি
পুজোর সময়ে
জেঠুমণি এন্ড কোং
ল্যাংড়া পাহান
রুআহা
বাঘের মাংস এবং অন্য শিকার
পহেলি পেয়ার
সবিনয় নিবেদন
অন্বেষ
হাজারদুয়ারী
নিনিকুমারীর বাঘ
ইলমোরাণদের দেশে
সাজঘরে, একা
বনজ্যোৎস্নায়, সবুজ অন্ধকারে
পঞ্চপ্রদীপ
কাঙ্গপোকপি
চানঘরে গান
অভিলাষ
ঋভু ১ম, ২য়, ৩য়

বুদ্ধদেব গুহর জলরঙে আঁকা ছবির অ্যালবাম

রিইউনিয়ন (পেপারব্যাক)

কিছু কথা

শুধুমাত্র বড়দের জন্যেই লেখা আমার উপন্যাস, এযাবৎ আমার জীবনের মহত্তম কিনা জানিনা, তবে বৃহত্তম উপন্যাস "মাধুকরী" লেখবার আগে যখন মধ্যপ্রদেশের নানা জায়গাতে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম সেই সময়েই ইন্দোর থেকে "ধার" হয়ে একদিন মাণ্ডুতে গিয়ে হাজির হই। অভিভূত হয়ে গেছিলাম মাণ্ডু দেখে।

পৃথিবীর ও আমাদের দেশেরও অনেক দুর্গ দেখেছি কিন্তু মাণ্ডু দেখে অভিভূত হয়ে যাই। দুর্গ তিনরকমের হয়। মরুভূমির দুর্গ, যেমন রাজস্থানের জয়সালমির, পার্বত্য দুর্গ, যেমন একসময়কার মালোঁয়ার বিন্ধ্যপর্বতের উপরের মাণ্ডু, অথবা পশ্চিমঘাটের উপরে ছত্রপতি শিবাজীর নাম-জড়ানো বিখ্যাত দুর্গ রায়গড়, অথবা সমুদ্র-দুর্গ, যেমন ভারতের পশ্চিম উপকূলে পর্তুগীজ বম্বের কাছের 'জঞ্জিরা', অ্যাবিসিনিয়ান জলদস্যু সিধীর বানানো দুর্গ, যা অনেকবার চেষ্টা করেও ছত্রপতি শিবাজী দখল করতে পারেননি।

এই পার্বত্য দুর্গগুলির মধ্যে 'মাণ্ডু' সমসাময়িক পৃথিবীর ইতিহাসে সমুজ্জ্বল ছিল। আজও আছে।

আজকালত আর মানুষের ব্যক্তিগত শৌর্য-বীর্যের কোনো দাম নেই। ব্যক্তি আজকাল ফালতু হয়ে গেছে। এখন মেসিন আর কম্প্যুটারের যুগ। এই যুগে ওই রকম সব দুর্গর কোনো প্রয়োজনই নেই। হাজার মাইল দূর থেকে কম্প্যুটারের বোতাম টিপেই এখন একটি দুর্গকে সহজে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যেতে পারে।

আজকের জগতের সবজান্তা মানুষে ভুলে গেছে যে, তার ইতিহাস, তার সভ্যতা, তার সংস্কৃতি গড়ে উঠতে লেগেছিল বহু হাজার বছর কিন্তু তা নিশ্চিহ্ন করতে লাগবে কয়েক সেকেণ্ড মাত্র।

পৃথিবীর আগামী দিনের ইতিহাসে মাণ্ডুর মতন কোনো দুর্গ বানানোর কথা কোনো দেশের কোনো নৃপতি বা স্বৈরাচারী বা গণতান্ত্রিক প্রথায়

ক্ষমতাতে আসা নেতা ভাববেনও না। তাই, আমাদেরই হঠকারিতাতে তা নষ্ট হয়ে যাওয়ার আগে তোমরা অবশ্যই ওই দুর্গ একবার দেখে আসার চেষ্টা কোরো।

ওদিকে গেলে, ইন্দোর থেকে উজ্জয়িনী যেতেও ভুলো না এবং মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ভোপালে গেলে, সেখান থেকে আদিম মানুষের গুহাশ্রয় ভীমবৈঠকাও।

একটি সাবধানবানী দেওয়া দরকার তোমাদের জন্যে। ভীমবৈঠকাতে গেলে কখনওই কোনো রকম সুগন্ধি মেখে যেও না, না পারফ্যুম, না আতর। সিগারেটও খেওনা কেউ। সুগন্ধি মাখলে বা সিগারেট খেলে অতিকায় সব মৌচাক থেকে হাজার হাজার বোলতা আক্রমণ করে তোমাকে ধরাশায়ী করে দেবে। প্রতিবছরই কিছু অনভিজ্ঞ মানুষের মৃত্যুও হয় ভীমবৈঠকার বোলতাদের কামড়ে। অতএব সাবধান।

তোমাদের শুভার্থী

বুদ্ধদেব গুহ

বালিগঞ্জ

পোস্ট বক্স নং ১০২৭৬

কলকাতা ৭০০ ০১৯

ক্রিসমাস, ১৯৯৫

পুবের আকাশ সবে লাল হচ্ছে।

রূপমতী বসেছিলেন রূপমতী মহলের উপরের চবুতরায়। মাথার উপর পাথরের গম্বুজময় চাঁদোয়া ছিল পশ্চিমে। কিন্তু সেই চাঁদোয়ার আশ্রয় ছেড়ে তিনি এসে বসেছিলেন পুবের ছাদের এক কোণে। যেদিকে নিমারের উপত্যকা এক লাফে নেমে গেছে হাজার হাজার ফিট নীচে। খাড়া, ভারী সুন্দর এবং ভয়ঙ্কর সেই উপত্যকা। গভীর জঙ্গলময়। মাঝে-মাঝে ভিলদের দু-একটি ছোট গ্রাম। উষাকালের এই আধো-অন্ধকারে এখন খুঁজে বের করাই মুশকিল। সন্ধ্যের আগে বরং ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখে বোঝা যায় যে গ্রাম আছে কোথাও কোথাও। কুঁড়ি-সকালের কোরা গন্ধের কোরা রঙের শামিয়ানার মতো হালকা কুয়াশার আস্তরণে মোড়া জঙ্গল। হরজাই গাছ। বসন্তের ভোরের গায়ের মৃদু সুগন্ধে ভারী হয়ে আছে নিমারের দিগন্তলীন এই উপত্যকা।

লাল হচ্ছে আস্তে আস্তে পুবের আকাশ। খুবই আস্তে আস্তে। লজ্জা পেলে, তোমাদের কারও কারও গাল যেমন লাল হয়; তেমন একদমকে নয়। অমলতাস গাছের থোকা-থোকা হলুদ ফুলে সেই লালের আভাস লেগে তাদের হলুদ ধীরে ধীরে গড়িয়ে যাচ্ছে কমলাতে। তিতির, বটের, আসকল, ময়ূর ডাকছে নীচের উপত্যকা থেকে। তাদের ঐকতান, ভোরের গায়ের গন্ধের সঙ্গে মাখামাখি হয়ে আলতো হাওয়ায় উঠে আসছে উপরে, কুয়াশারই মতো।

রূপমতীর পরিচারিকা বিজলি আঙুল দিয়ে তাঁকে দেখাল দূরে, পুবে। হঠাৎ হাত তোলায় তার কোমরের রুপোর পঁইছা আর চাবির থোকা ঝুনঝুনিয়ে উঠল। বেজে উঠল পায়ের পায়জোর।

বলল, "ওই যে! যাচ্ছে দেখা।"

সূর্য উঠছে। নর্মদা নদের উপরে। জলের উপর ভোরের রোদ পড়ে চিকচিক করে উঠছে আদিবাসী গোঁন্দদের দেবতা বুড়হা নাঙ্গের বউ, দুধ নাঙ্গের চকচকে সাদা শরীরের মতো জলরেখা। পশ্চিমের গম্বুজ আর চাঁদোয়ার তলায় ততক্ষণে তানপুরা আর সারেঙ্গীর সঙ্গে গলা মিলিয়ে ভৈরবীতে আলাপ শুরু করেছে রূপমতীর সখী মুন্নী। ভৈরবীর কোমল 'রে' আর কড়িমার সঙ্গে চিকন চুয়াপাখির চকিত ডাক, অমলতাস ফুলের রঙের নরম আভাস, নিমারের উপত্যকার গায়ের গন্ধ সব মিলেমিশে ছড়িয়ে একাকার হয়ে যাচ্ছে। যেন এক অদৃশ্য

আতরদান হঠাৎ গড়িয়ে উলটে গিয়ে ফিরদৌস আতরই ছড়িয়ে গেছে নিমারের আদিগন্ত উপত্যকায়। হাতজোড় করে, হিন্দু রূপমতী, ভক্তিভরে নমস্কার করলেন নর্মদার দিকে চেয়ে, সূর্যকে।

রূপমতীর শরীর যদি খারাপ না থাকে, তাহলে শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা-হেমন্ত-বসন্ত কোনো ঋতুতেই একদিনও তিনি ভুলে যান না সূর্যোদয়ের আগে এখানে এসে সূর্য-প্রণাম করতে। ঘন বর্ষায় সূর্যদেব যখন অভিমানে মুখ লুকোন তখনই শুধু আসা হয় না কিছুদিন। আগে সূর্যপ্রণাম, তারপর সবকিছু।

রূপমতী এখানে এসে সূর্যপ্রণাম করতেন, তাই বিন্ধ্যপাহাড়ের উপরের পঁয়তাল্লিশ বর্গমাইল ছড়ানো গড় এবং রাজধানী মাণ্ডুর এই বিশেষ মেহালটির নামই ছিল "রূপমতী মেহাল"। এই মেহালের পরই সোজা নীচে নেমে গেছে উপত্যকা। কয়েক হাজার ফিট।

চান সেরেই এসেছিলেন রূপমতী। লম্বা, ছিপছিপে শরীর। সরু কোমর ছাপিয়ে ভেড়াঘাটের নর্মদার গিরিখাত থেকে বেরনো প্রপাতের মতোই ঝাঁপিয়ে পড়ছে যেন কর্পূর জাফরান আতর আর গোলাপজলে চান-করে-ওঠা রূপমতীর বাঁধ-না-মানা সুগন্ধি চুল। সেই খুশবু উড়ে যাচ্ছে আফগান নবাব বাজবাহাদুরের খুদাতালার তখত আর হিন্দু রূপমতীর দেবীর দিকে।

গন্ধ যখন ওড়ে, ফুল যখন ঝরে, তখন শব্দ হয় না কোনো।

বনে অথবা মনে।

হিন্দুর মেয়ে, বড় ভাল গাইয়ে রূপমতী যে কী করে আফগান নবাব বাজবাহাদুরের রাজধানীতে এসে পৌঁছেছিলেন তা নিয়ে লোকের মুখে আজও নানারকম গল্প শোনা যায়। এক গল্পের সঙ্গে অন্য গল্পের মিল নেই।

নানারকম গল্প। কিন্তু সে সব গল্পের কথা পরে।

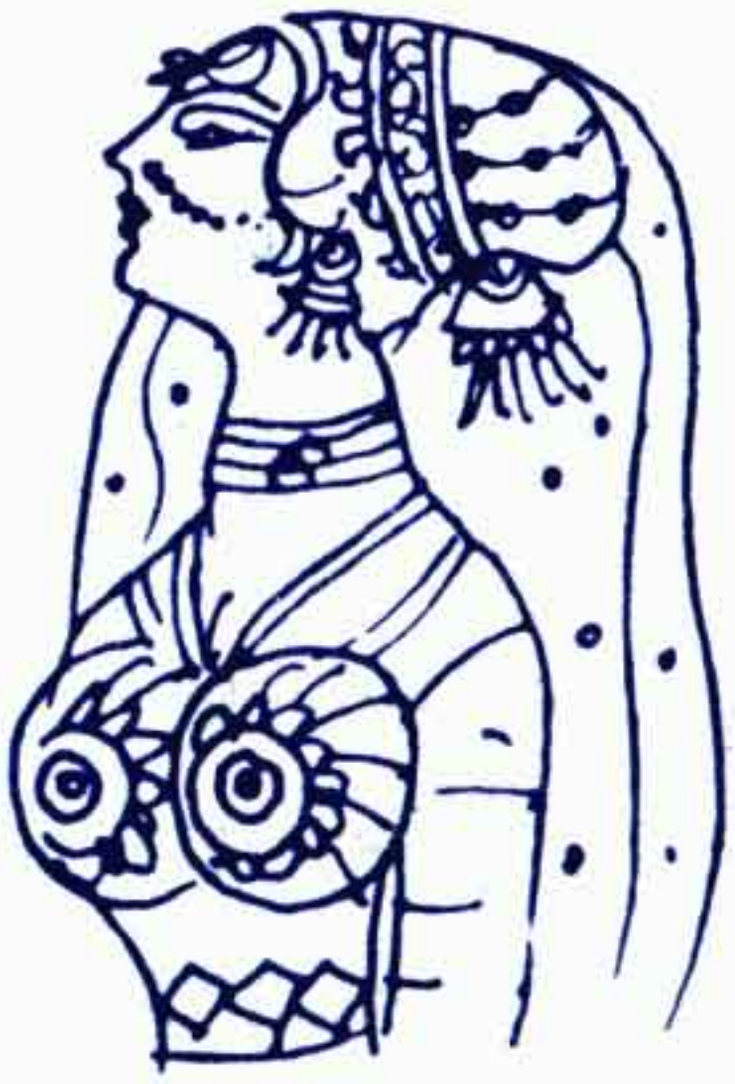

বিখ্যাত মুসলমান ঐতিহাসিক ফিরিস্তা-উল্লিখিত একটি লোকগাথায় আছে যে, পাঁচশো নব্বুই থেকে ছ'শো আঠাশ খ্রীস্টাব্দ অবধি রাজত্ব করেছিলেন যিনি, সেই খুসরু পরভিজের সময়ে আনন্দ দেও রাজপুত বলে একজন লোক মাণ্ডুর দুর্গটি বানিয়েছিলেন। মাণ্ডুর নাম আগে ছিল মণ্ডপ দুর্গ। ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এ দুর্গ বানানো হয়েছিল।

আবুল ফজল কিন্তু অন্য কথা বলেছেন। মাণ্ডু নামটি নাকি আসে তারাপুরের মণ্ডনা নামের এক স্বর্ণকারের নাম থেকে। মণ্ডনাই নাকি পরশপাথর খুঁজে পেয়েছিলেন। মণ্ডনা পরশপাথরটি দিয়ে দেন "ধার"-এর রাজাকে। "ধার"-এর রাজা সেই সুবাদে প্রচণ্ড বড়লোক হয়ে গিয়ে বিন্ধ্যপাহাড়ের উপর এই দুর্গ বানান এবং মণ্ডনার প্রতি কৃতজ্ঞতাবশত সেই দুর্গের নাম রাখেন 'মাণ্ডু'।

'মণ্ডপ-দুর্গ' নামের কোনো ভিত্তি অবশ্য পাওয়া যায় না ইতিহাসে। প্রাকৃত ভাষায় 'মণ্ডভ' বলে একটি শব্দ আছে।

'মাণ্ডভ' শব্দটি মধ্যযুগের পারসিক ঐতিহাসিকদের লেখাতেও আছে। মাণ্ডভ থেকেই বিকৃত হয়ে মাণ্ডু শব্দটি এসেছে বলে পণ্ডিতদের ধারণা।

তার পরের তিন শতাব্দীতে ইতিহাস মাণ্ডু সম্বন্ধে নীরব। মনে হয়, দশম শতাব্দীতে মাণ্ডুর এই দুর্গ, গুর্জর-প্রতিহারী রাজাদের কনৌজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। দশম শতাব্দীর শেষের দিকে মালোঁয়ার পারমার রাজাদের খুব রমরমা হয় এবং তাঁরা উজ্জয়িন এবং ধার-এ তাঁদের রাজধানী নিয়ে যান। এই ধার জায়গাটি সমতলে। তার একদিকে ইন্দোর, অন্যদিকে ভোপাল। শিপ্রা নদীর পারের উজ্জয়িনও বেশি দূর নয়। এখান থেকে বিন্ধ্যপাহাড়ের উপরের মালভূমির এই মাণ্ডুর দুর্গের দূরত্ব মাত্র কুড়ি মাইলের মতো।

রাজা ভোজের নাম তোমরা অনেকেই শুনেছ হয়তো। বেতাল পঞ্চবিংশতি পড়েওছ হয়তো কেউ কেউ। ভালুকের থাপ্পড়-খাওয়া সেই 'স-সে-মি-রা'র গল্পও। রাজা ভোজ আর রাজা মুঞ্জ-এর সময়েই পারমার রাজারা সবচেয়ে ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন।

তোমাদের মধ্যে কেউ যদি মাণ্ডুতে বেড়াতে যাও, তাহলে দেখতে পাবে মাণ্ডুর এলাকার অনেক 'তালাও'-এর মধ্যে একটির নাম হচ্ছে 'মুঞ্জ-তালাও'। তালাও মানে হচ্ছে দীঘি। গজনির নবাব মেহমুদ যদিও ওই অঞ্চলের হিন্দু রাজাদের একেবারে তটস্থ করেই রেখেছিলেন কিন্তু মাণ্ডুর দুর্গের

ভৌগোলিক অবস্থান এবং তাঁর সেনাদের সাহসের কারণে তাঁকেও পারমার ভোজরাজকে সমীহ করে অন্য পথ দিয়েই ফিরে যেতে হয়েছিল অনেক যুদ্ধ জয়ের পরে, শুধু মাণ্ডুর দুর্গমতা ও দুর্ভেদ্যতারই কারণে।

ভোজরাজ্যের সবচেয়ে সম্মানিত দেবী ছিলেন সরস্বতী। সরস্বতীর একটি মূর্তি পাওয়া যায় এখানে। সেই মূর্তির গায়ে প্রাকৃত ভাষাতে সরস্বতী-স্তবের মন্ত্রও খোদিত ছিল বলে জানা গেছে।

ধার-এর প্রবল-প্রতাপ রাজা উদয়াদিত্যের পর তাঁর অপেক্ষাকৃত দুর্বল বংশধরেরা পাহাড়ের উপরের মাণ্ডুতে মাঝে-মাঝেই রাজধানী তুলে নিয়ে আসতেন ধার-এর সমতল ভূমি থেকে। পরে মাণ্ডুকেই স্থায়ী রাজধানী করে নেন তাঁরা, তাঁদের নিরাপত্তার কথা ভেবেই।

এমনিতেই তো ইতিহাস তোমাদের অনেকেই পড়তে হয় স্কুলে। মাণ্ডুর রাজা-রাজড়াদের ইতিহাস তোমাদের ভাল না-ও লাগতে পারে। তাই চলো, এবার মাণ্ডুর কথাতেই ফিরি। তারপরে একলাফে চলে যাওয়া যাবে বেশ কয়েক শতাব্দী পরে। রাজা আর নবাবদের কাছে।

মাণ্ডুর বাজবাহাদুর আর রূপমতীর নাম ইতিহাসে অমর হয়ে আছে।

যে-মাণ্ডু এঁদের জীবনকাহিনীর পটভূমি, সে জায়গাটি কেমন সে সম্বন্ধে বিশদ করে এবার তোমাদের একটু বলে নিই।

আগেই বলেছি, মাণ্ডু দুর্গটির এলাকা ছিল পঁয়তাল্লিশ বর্গমাইল। বিন্ধ্যপাহাড়ের এক দুর্গম মালভূমির উপর বিস্তৃত মসজিদ, মাদ্রাসা, তাবেলা, মেহালের পর মেহাল, তালাও-এর পর তালাও নিয়েই এই মাণ্ডু। কী সুন্দর যে ছিল এই মাণ্ডু রূপমতী আর বাজবাহাদুরের সময়ে তা আজও সেখানে গেলে, যার চোখ আছে আর কল্পনা আছে, তার পক্ষে অনুমান করে নিতে অসুবিধে হয় না কোনো। রুক্ষ দুর্ভেদ্যতার ভিতরে যে কী কমনীয়তা আর আনন্দের উপকরণ ছিল এখানে একদিন, তা ভাবলেও অবাক হতে হয়।

'ধার' হয়েই আসতে হয় মাণ্ডুতে, ইন্দোর থেকেই কাছে পড়ে। ইন্দোর থেকে বেরিয়ে এসে যে জায়গায় সুন্দরী নদী শিপ্রার তীরের উজ্জয়িন শহরের রাস্তা বেরিয়ে গেছে, সেই পথে না গিয়ে সোজা পশ্চিমে চলে আসতে হয়। 'ধার'-এর মহারাজার বাড়িটি দেখা যায় দূর থেকে। ধার থেকে বাঁয়ে পথ চলে গেছে মাণ্ডুর দিকে।

পাহাড়ের উপর এই দুর্গে ওঠার বিভিন্ন পথ আছে। সেইসব পথে ফটক আর দরওয়াজা। সেই সব ফটক পেরিয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী সেনাবাহিনীর পক্ষেও তখন যাওয়া অতি কষ্টকর ছিল। 'আলমগির' দরওয়াজা, 'ভাঙ্গি' দরওয়াজা, 'কামানি' ও 'গাদি' দরওয়াজা। দেখার মতো সব।

মহম্মদ খিলজি চোদ্দশো ছত্রিশ সালে আফ্রিকা মহাদেশ থেকে এনে বাওবাব গাছ লাগিয়েছিলেন মাণ্ডুতে। বাওবাব,

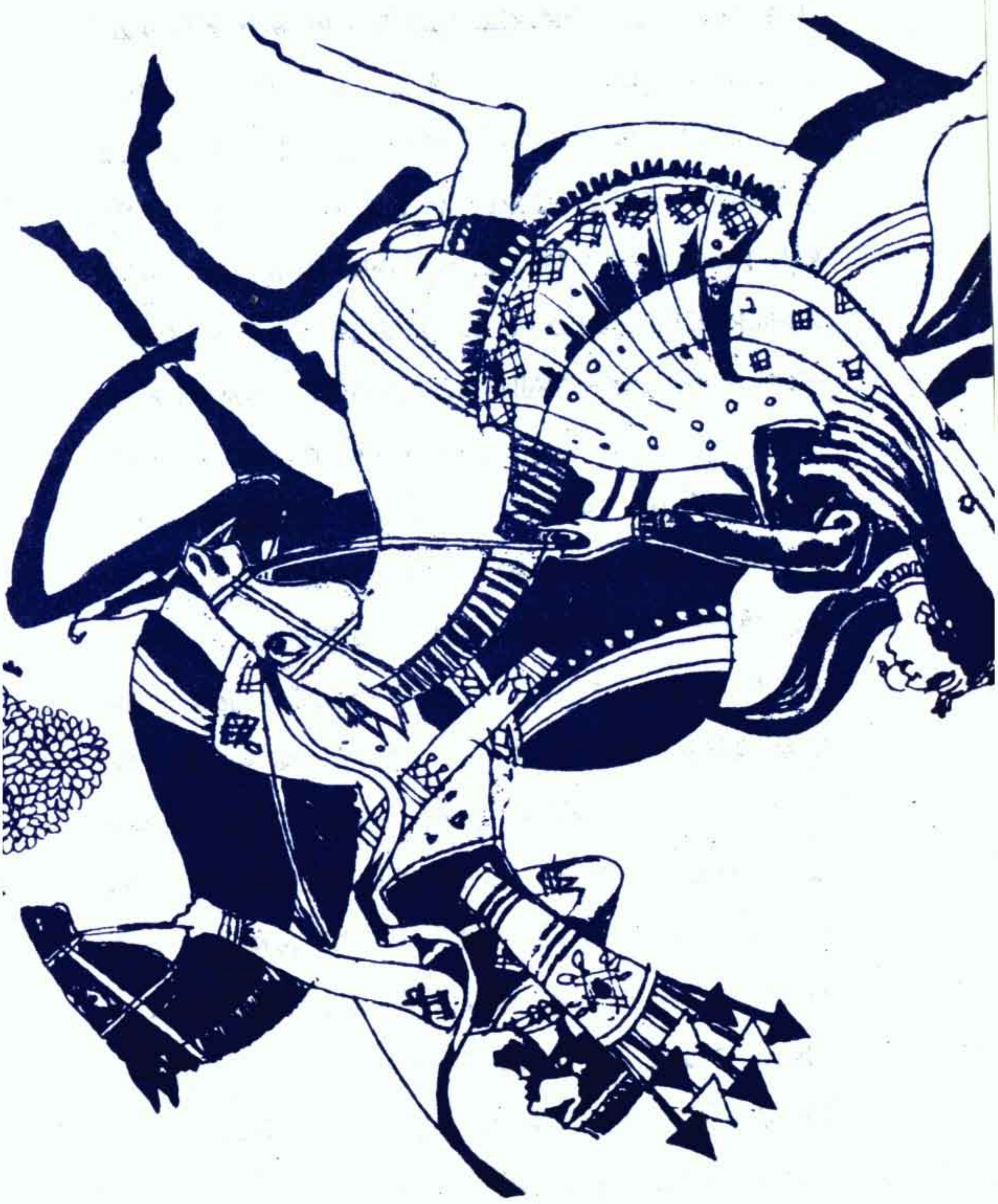

প্রকৃতির এক আশ্চর্য খেয়াল। পুব আফ্রিকাতে যখন গেছিলাম তখনও এই বাওবাবগাছ দেখেছিলাম অনেক। কত হাজার বছরের সব পুরনো স্থবির গাছ। প্রকাণ্ড মোটা হয় এদের গুঁড়ি। সুকুমার রায়ের আবোল তাবোলের মূল সংস্করণে হট্টমুলার গাছের যে-ছবি আছে, তার সঙ্গে এই গাছের মিল আছে। সেই ছবি তোমরা কি দেখেছ কেউ?

ইংরেজিতে এই গাছকে বলে 'আপসাইড-ডাউন ট্রিজ'। এই গাছের আরেক নাম 'খুরসানি ইমলি'। গরমের দিনে মাণ্ডুর জাহাজ মেহালের আর জামা মসজিদের পাশে গাছের ছায়ায় বসে মাণ্ডুর অধিবাসীরা বাওবাবের বড় বড় ফল বিক্রি করে, কেটে কেটে, মাণ্ডুতে যাঁরা বেড়াতে যান তাঁদের জন্যে। খিরনিগাছও আছে অনেক। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড। ছায়া-দেওয়া গাছ। গোল-গোল পাতা। মার্চ এপ্রিল মে মাসে লাল-লাল ফল হয়। খেতে মিষ্টি। আরও কত গাছ। আতাগাছ। কেঁদ বা বিড়িপাতার গাছ। কাড়োয়া টেমরু, দেখতে কেঁদেরই মতো। কিন্তু কেন্দুর ফল মিষ্টি। এর ফল টক। কেঁদ আর টেমরুও গরমের সময়ই হয়। চারোলি বলেও একরকমের বড় বড় গাছ দেখা যায় এখানে। লম্বাটে গড়নের বড় বড় পাতা। এপ্রিল-মে'তে ফল হয়। টক-টক খেতে। ধাওড়াগাছ। গঁদের আঠা হয় এ গাছ থেকে। মহুয়া, আম, কাঁটাল, পলাশ। জামুন। ইমলি বা তেঁতুল। আমলা বা আমলকীর গাছ। নিম। বহেড়া।

রোসিয়া ঘাসে ছেয়ে থাকে মাণ্ডুর পাথুরে লাল মাটি। এই ঘাস

থেকে একরকমের তেল হয়। ওষুধ বানায় এখানের লোকেরা এই তেল থেকে। গোন্দিঁয়া ঘাসও হয়। গোরুতে খায় এই ঘাস। গিরমিলা অর্থাৎ অমলতাস এখানের বিশেষত্ব। দেখতে অনেকটা রাধাচূড়ার মতো। এপ্রিল-মে মাসে হলুদ-হলুদ লম্বা বিনুনির মতো ফুল ঝোলে গাছে গাছে।

বর্ষায় কাকড়ি হয়। বালম কাকড়ি।

মাণ্ডুতে ফুলও কম হয় না। পদ্মের জন্য মাণ্ডুর তালাওগুলি বিখ্যাত। গরমের সময় লাল পদ্মে ভরে যায় সবকটি তালাও। ছোট ছোট একরকমের পদ্ম হয় এখানে, নাম কুমুদিনী। বর্ষা ও শীতে। লাল আর সাদা। যখন উদাস বিধুর হাওয়া ছাড়ে গরমের দিনে তখন পদ্মপাতারা একসঙ্গে হাত নাড়ে। যেন হাত নেড়ে নেড়ে বলে, 'যাব না, যাব না ঘরে...।' আর হাওয়া যখন উল্টোদিকে বয়, তখন পাতার ভিতরের দিকের সাদা রঙ বেরিয়ে পড়ে। তখন তারা মাথা নেড়ে নেড়ে বলে, কথা রাখলে না তো! এলে না তো!

মুসলমান ঐতিহাসিক গুলাম ইয়াজদানি মাণ্ডুকে 'শারাংপুর' বা 'আনন্দের শহর' বলে অভিহিত করেছিলেন। মাণ্ডু এখনও আনন্দের শহর বলেই পরিচিত সারা পৃথিবীর কাছে।

রূপমতী সম্বন্ধে নানা ঐতিহাসিক নানা কথা লিখে গেছেন। ইতিহাস তার নাম দিয়েছে 'পদ্মবালা'। 'লেডি অব লোটাস'। অনেকের মতে রূপমতী ছিলেন ধরমপুরীর এক ব্রাহ্মণের মেয়ে। এরকম গাইয়ে তখন নাকি সে অঞ্চলে ছিলোই না।

রূপমতী মেহালের দুই গম্বুজের মধ্যের ঝরোকাও বাজবাহাদুর বানিয়ে দেন তাঁর জন্যে, যাতে ধার্মিকা রূপমতী নর্মদার দিকে চেয়ে শীত-সকালেও সূর্যপ্রণাম করতে পারেন। এখানে এলে, ঘুরে বেড়ালে, পাথরে পাথরে, চাতালে চাতালে যেন নৃত্যরতা সুন্দরীদের পায়ের ঘুঙুরের শব্দ শোনা যায়। এক আশ্চর্য, ক্ষুধিত পাষাণপুরী এ।

রূপমতীর প্রিয়তম রাগ নাকি ছিল মেঘমল্লার। লোকে এও বলে যে, তাঁর নাম ছিল রূপা। বাজবাহাদুর আদর করে নাম রাখেন রূপমতী। কোমলগান্ধারের মতো। রূপমতী মেহালের নীচের নিমার উপত্যকাতে ঘাসেরই মতো স্বপ্ন বোনা আছে। গ্রীষ্মের হালকা গরম বাষ্প ও শীতের কুয়াশা না থাকলে কুড়ি-বাইশ মাইল দূরের নর্মদাকে পরিষ্কার দেখা যায় এই রূপমতী মেহাল থেকে। টিটোরি বা টিটি পাখি চমকে চমকে ডেকে বেড়ায় অতীতের কতই না কথা মনে করিয়ে দিয়ে। তিত্বর, বটের, কালি তিত্বর, কালি চিড়িয়া, ছোট চাতক পাখি, নানারকম বক, সারস, ময়ূর। ডাঙা ও জলের নানান পাখিই ছিলো। আজও নানা জাতের ঝাঁক-ঝাঁক পায়রা ডানায় রোদ মেখে নিয়ে উজ্জ্বল রোদকণা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে স্বপ্ন দিয়ে তাঁত বোনে মাণ্ডুর আকাশে আকাশে। শীতের মুখে উড়ে আসে নানা দেশ থেকে পরিযায়ী হাঁসের দল। তালাওয়ে তালাওয়ে সুখের সংসার পাতে। স্বগতোক্তি করে ভেসে বেড়ায় তালাওয়ের পদ্মরাঙা জলে।

ওরাও যে কবে খোঁজ পেয়েছিলো এই আনন্দ আর খুশির শহরের তা কে জানে! কত হাজার বছর ধরে সাইবেরিয়া এবং আরও কত অঞ্চল থেকে কত রকম পাখি পথ চিনে উড়ে আসে প্রতি বছর। আনন্দে ভরপুর হয়ে, অন্যকে ভরপুর করে আবার ফিরে যায় শীতশেষে।

ভিল উপজাতিদের বাস এখানে। তারা শিকারির জাত। রাজা আর নবাবরা এখানে কত বাঘ ও চিতা যে শিকার করেছেন তার লেখাজোখা নেই।

রূপমতীও বাজবাহাদুরের সঙ্গে ঘোড়ায় চেপে বাঘ শিকারে যেতেন। এখন অবশ্য জানোয়ার মাগুতে বিশেষ নেইই। রাত নামলে, সাবধানী, তুরতুরে খরগোশেরা ইতিউতি চাইতে চাইতে ঘাসের বনে খাবার খুঁটে খায়। তাদের পেছনে পেছনে আসে সাবধানী, ধূর্ত শেয়ালেরা। হায়েনার বুককাঁপানো হাসি শোনা যায় মাঝরাতে। কখনও-কখনও।

রূপমতী থাকতেন জাহাজ মেহালে আরও অসংখ্য সব নাম-না-জানা সুন্দরীদের সঙ্গে। জাহাজ মেহালে তখন দুটি সুইমিং-পুল ছিল। একতলাতে একটি, দোতলাতে একটি। আজ থেকে কত শ' বছর আগে। ভাবা যায়! পার্সিয়ান হুইলে করে জল উঠত দোতলার সুইমিং-পুলে। মোষেরা ঘুরে ঘুরে টানত সেই পার্সিয়ান হুইল। জল উঠত জাহাজ মেহালের মস্ত তালাও থেকে। ইলেকট্রিক পাম্পের মতন।

মারোয়াড়ি ব্যবসাদারদের বোধহয় কোনো দেশবিচার নেই।

সময় বিচারও নেই। অন্তত এখানের লোকেরা তাইই বলেন। যেখানেই পয়সা কামাবার মওকা, সেখানেই তাঁরা গিয়ে হাজির হয়েছেন চিরদিনই। তাঁদের মতন দুঃসাহসী এবং কঠোর পরিশ্রমী ভারতের কম প্রজাতিই।

গাধা শাহ আর ভইষা শাহ বলে দুই মারোয়াড়ি, হোশাঙ্গ শাহ ঘুরির সময় মাণ্ডুতে এসে আস্তানা গাড়েন। কী করে তাঁরা এলেন তা নিয়েও গল্প আছে। লোকে বলেন, গাধা শাহ তাঁর মাকে পাঠিয়েছিলেন তীর্থ করতে অনেক টাকা-পয়সা দিয়ে। সঙ্গে তাঁর গোঁফের চুলও খানিকটা কেটে দিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, পয়সা যদি ফুরিয়েও যায়, তবে যাঁকেই এই গোঁফের চুল দেখাবে আর বলবে যে, আমার ছেলে হচ্ছে দা গ্রেট গাধা শাহ, অমনি তাঁরা তোমাকে টাকা দেবেন।

গুজরাটে গিয়ে গাধা শাহর মায়ের টাকা তো গেল ফুরিয়ে। তখন গুজরাটিদের কাছে ছেলের গোঁফ পেশ করলেন তিনি। গুজরাটিরা বললেন, ওসব বুজরুকিতে বিশ্বাস করি না আমরা। গাধার কাছেও ঠকব এমন গাধা আমাদের ভাবা উচিত নয়। টাকা-ফাকা দেব না।

মা গিয়ে নালিশ করলেন।

গাধা আর ভইষা শাহ তারপর একসময় মাণ্ডুতে চলে আসেন। সোনগড়ের খাড়া পাহাড়ের নীচে দুটি মস্ত ইঁদারা খুঁড়ে তাঁরা নাকি তেল আর ঘি সেখানে মজুদ করেছিলেন। মাণ্ডুতে তখন

যজ্ঞ-টজ্ঞের জন্য এবং নবাবি খানা বানানোর জন্যও নিশ্চয়ই ঘি'র দরকার ছিল অনেক। এবং প্রদীপ জ্বালানোর জন্য তেলের চাহিদাও ছিল কম নয়।

একদিন গুজরাটি ব্যবসাদারেরা গুজরাট থেকে গাধা অ্যাণ্ড ভইষা কোম্পানির কাছে তেল ও ঘি কিনতে আসেন। তখন তাঁরা বলেন যে, আমাদের মাকে আপনারা বেইজ্জত করেছিলেন, টাকা দেননি মোটে, গাধা শাহর গোঁফ দেখানো সত্ত্বেও, তেল ঘি আপনাদের দেব থোড়াই!

কথা কিছু খারাপ বলেননি তাঁরা। কারণ আমরা জানি যে, "গোঁফের আমি গোঁফের তুমি, গোঁফ দিয়ে যায় চেনা।"

তারপর বললেন, ঠিক হ্যায়। বেচতে পারি, কিন্তু দুটি শর্তে। প্রথম শর্ত হল, আজ থেকে আপনারা আপনাদের দাঁড়িপাল্লাতে চারটি করে সুতোর বদলে মোটে তিনটে সুতো ব্যবহার করবেন। আর ধুতি পরার সময়, মাত্র একটি কাছা কোমরে অথবা পেছনে গুঁজতে পারবেন।

সেই থেকেই নাকি গুজরাটি ব্যবসাদারেরা দাঁড়িপাল্লাতে তিনটি সুতো ব্যবহার করেন, আর ধুতির কাছার একদিকটা কোমরে গুঁজে অন্যদিকটি হাতে নিয়ে চলেন।

এসব লোকগাথার কিছু হয়তো বানানো। বলা যায় না, অনেকখানিই হয়তো তাই। কিন্তু বানানো হলেও বা ক্ষতি কী? লোকমুখে এসব গল্প চলে আসছে বহু বছর ধরে। শুনতে তো মজাই লাগে! কী বলো?

'আনন্দের শহর' মাণ্ডুর মানুষ সেখানে আনন্দের কোনো উপকরণই বাদ দেননি। এখানে পান-রসিক লোকও ছিলেন অনেক। কতরকম নবাবি কেতার পানই যে ইস্তেমাল হত! এখনও দোকানে দোকানে মালবী, মগধী, বাঙালি, মাদ্রাজি পান পাওয়া যায়। পানের সঙ্গে গুটকা।

ইত্বরের ছড়াছড়ি ছিল। খসস, রুহ খসস, গুলাব, রাত-কা-রানী, হিন্বা, বেলি, অম্বর, ফিরদৌস, শামামা—আরও কত নাম-জানা আর নাম-না-জানা সব ইত্বর।

বাজবাহাদুর যখন শিকারে যেতেন, তখন একরকমের ইত্বর ব্যবহার করতেন, তার নাম "ইত্বর-ই-গ্বিল"। গ্বিল হচ্ছে মাটি। মানে, মৃত্তিকাগন্ধি আতর। বাঘ যাতে হাঁউ-মাউ-খাঁউ মানুষের গন্ধ না পাঁউ, সেই বন্দোবস্তেই এই মাটির গন্ধের আতর মেখে বাঘ-শিকার যেতেন বাজবাহাদুর।

মাণ্ডুর দুর্গ নাকি সেই সময়ে পৃথিবীর বৃহত্তম দুর্গ ছিল। ঐতিহাসিকরা বলেন যে, শুধু বেলজিয়ামে অন্য একটি প্রায় এত বড় দুর্গ ছিল ; সেটিই দ্বিতীয় ছিল দুনিয়াতে। দরওয়াজা, হাবেলি, তাবেলা (আস্তাবল) আর মসজিদ কিছুরই কম্মি ছিল না মাণ্ডুতে।

মাণ্ডুর কথা তো শুনলে অনেক, এবারে আবার চলো যাই কিছুক্ষণের জন্য মাণ্ডুর শাসকদের ইতিহাসে। মাণ্ডুরই এক শাসক বাজবাহাদুর অবধি পৌঁছেই আবার মাণ্ডুর কথাতেই ফিরে আসা যাবে। বাজবাহাদুররা ছিলেন আফগান।

দিল্লির নবাবরা ইতিমধ্যে মাণ্ডু এবং আশপাশের জায়গার, 'ধার'সুদ্ধু, মালিক হয়ে গিয়েছিলেন।

মহম্মদ বিন তুঘলকের অধীনে একজন কর্মচারী ছিলেন তাঁর নাম দিলওয়ার খান ঘুরি। তাঁকে মালোয়াঁর রাজ্যপাল করে দেন মহম্মদ বিন তুঘলক। দিল্লির মসনদ নড়বড়ে হয়ে যেতেই ঘুরি নিজেই মালোয়াঁর নবাব বনে গেলেন। বোকা তো আর ছিলেন না। তাঁর রাজধানী তিনি 'ধার'-এই রেখেছিলেন বটে, কিন্তু মাণ্ডুতে আসতেন মাঝে-মাঝেই। চোদ্দশো পাঁচ শতাব্দীতে দিলওয়ার খাঁ মারা গেলে তাঁর ছেলে আল্প খাঁ নবাব হন। তাঁর আসল নাম ছিল হোশাঙ্গ শাহ। তিনিই প্রথম মাণ্ডুকে পুরোপুরি রাজধানী করেন। মাণ্ডুর দুর্গের অনেকেই সম্প্রসারণ করেন হোশাঙ্গ শাহ। মুসলমান ঐতিহাসিকদের মতেও সেই সময়কার ভারতে তো বটেই পৃথিবীতেও মাণ্ডুর মতো বিরাট এবং এত সুরক্ষিত দুর্গ দেখা

যেত না। আজকে গিয়ে দেখলেও সত্যিই অবাক হয়ে যেতে হয় তার সৌন্দর্য, দুর্ভেদ্যতা এবং দুর্গমতা দেখে।

হোশাঙ্গ মারা গেলেন চোদ্দশো পঁয়ত্রিশ খ্রীস্টাব্দে। তাঁর ছেলে ঘজনি খাঁ নবাব বনলেন। কিন্তু এক বছর মাত্র নবাবি ছিলো তাঁর কপালে। পরের বছরই তাঁর এক অনুচর মাহমুদ খাঁ তাঁকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেললেন।

এই ঘজনি খাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মালোয়াঁতে ঘুরিদের নবাবি শেষ হয়ে গেলো। ঘুড়ি নয় কিন্তু, ঘুরি। তোমরা ভাল করে ইতিহাস পড়লে জানতে পারবে যে, আকাশের ঘুড়িরই মতো ঘুরিদের মধ্যেও পেটকাট্টি, বিষ-গেলানো ঘুরি ছিলো।

মাহমুদ শাহই মাণ্ডুর প্রথম খলজি শাসক। ভাল, খুবই ভাল যোদ্ধা ছিলেন মাহমুদ খাঁ। আরামপ্রিয় ছিলেন না। আরাম তাঁর কাছে হারাম ছিলো। তাঁকে সবাই-ই জানতেন লড়াকু নবাব বলে। তাঁর আমলেই মালোয়াঁ বিস্তৃতিতে অনেকই বেড়েছিলো। মান পেয়েছিলো। ছড়িয়ে পড়েছিলো মালোয়াঁর নাম। সবসুদ্ধ তেত্রিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন তিনি। সেই সময়ের মধ্যেই গুজরাট, দাক্ষিণাত্য এবং জৌনপুরের রাজাদের সঙ্গেই যে যুদ্ধ করেছিলেন তিনি তাই-ই নয়, দিল্লির নবাবদের সঙ্গেও টক্কর দিতে পিছপা হননি।

তবে, মেবার ছিল মেহমুদের আক্রমণের প্রিয় লক্ষ্য।

শুধু বড় যোদ্ধাই নন, মেহমুদ খাঁ অত্যন্ত বড় মনের, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, দয়ালু এবং সাহসী নবাবও ছিলেন। তাঁর আমলে

হিন্দু এবং মুসলমান প্রজারা সমান সচ্ছলতা এবং সুখে ছিলো। তাঁর নিজের ব্যক্তিগত গুণাবলীর জন্যেই মালোয়াঁ অত উন্নতি করেছিলো। ইতিহাস বারবার বলে যে, গুণ না থাকলে কেউই জীবনে বড় হতে পারে না। মাণ্ডুর ভিতরেও খুব উন্নতি হয়েছিলো সেই সময়েই। মাণ্ডুতে তাঁর নিজের কবরস্থান বানিয়েছিলেন তিনি। অপূর্ব! এখনও গেলে দেখতে পাবে। মাদ্রাসা, মানে, মুসলমানদের পাঠশালা বানিয়েছিলেন ; তাও চমৎকার। সেই মাদ্রাসাকে এখন সকলে 'আশরফি মেহাল' বলে। সেটিও দেখতে পাবে, গেলে।

মেহমুদ মারা গেলেন চোদ্দশো উনসত্তর খ্রীস্টাব্দে। তাঁর ছেলে ঘিয়াতউদ্দিন নবাব হলেন। কী বিদঘুটে নাম রে বাবা! নাম শুনে মনে হয় ঘাঁক করে কামড়েই দেবেন বুঝি। কিন্তু তিনি খুব ধার্মিক ছিলেন। বাবা অনেক যুদ্ধ করেছিলেন বলেই বোধহয় তাঁর ছেলে শান্তিপ্রিয় ছিলেন খুবই।

তবে, বাবার সঙ্গে ছেলের তফাৎ ছিল। সাহসী, ঠাণ্ডা-মাথা, লড়াকু বীর যোদ্ধা বাবা কষ্ট করে সব কিছু করেছিলেন আর যুদ্ধভীত তিনি ফুর্তিতে মেতে গেলেন, অনেক বাঙালি বড়লোকের ছেলেদের মতো!

বিবিই ছিল তাঁর পনেরো হাজার। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মেয়ে তারা। তাঁর ডাইনে এবং বাঁয়ে পাঁচশো সুন্দরী, অল্পবয়সী তুর্কি এবং পাঁচশো অ্যাবিসিনিয়ান যুবতী পুরুষের পোশাক পরে দাঁড়িয়ে থাকত, প্রহরী হিসেবে।

মাণ্ডুতেই থাকতেন বলে সেখানে আরাম ও বিলাসের আরও বন্দোবস্ত করেছিলেন তিনি। 'জাহাজ মেহাল' খুব সম্ভব মাণ্ডুর সব চাইতে সুন্দর মেহাল। বাজবাহাদুর আর রূপমতীর প্রিয় মেহাল।

এই জাহাজ মেহালের কথা বলে শেষ করা যায় না। এই মেহালের কথা পরে আরও বলছি তোমাদের।

ঘিয়াতের আমলেই বোধহয় জাহাজ মেহালের সবচাইতে বেশি ইজ্জত হয়েছিল। জাহাজ মেহাল তিনিই বানিয়েছিলেন। তাঁর রাজত্বের সময়ে দান, ধ্যান, সব প্রজার মধ্যে সমতা, ন্যায়-বিচার, ঔদার্য এই সব কিছুরই জন্যে মাণ্ডু খুবই বিখ্যাত হয়েছিল। অবশ্য, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ বলতে পারো, বাবার এত থাকলে যে-কেউই পরের ধনে পোদ্দারি করতে পারে। বাহাদুরি কী তাতে?

ঘিয়াতের যখন আশি বছর বয়স তখন তাঁর ছেলে নাসিরুদ্দিন তাঁকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেললেন। দিল্লির শাহানশাহ জাহাঙ্গির তাঁর স্মৃতিকথাতে এই বিশ্বাসঘাতক ছেলের নিজের বাবাকে খুন করার কথা খুব ঘৃণাময় আবেগের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। নবাবী ব্যাপারস্যাপার দেখে মনে হয় যে তখন নবাববংশে বুড়ো বাবাকে মকরধ্বজ আর চ্যবনপ্রাশ খাওয়ানোর চেয়ে বিষ খাওয়ানোরই বেশি চল ছিল। বাবাকে বিষ খাইয়ে নবাব তো হলেন নাসিরুদ্দিন পনেরোশো খ্রীস্টাব্দে। কিন্তু পাপবোধ তাঁকে একেবারেই জর্জরিত করে

রাখল সব সময়। ঝামেলাও পোহাতে হয়েছিল তাঁকে অনেকই।

মাত্র দশ বছর নবাবি করেই একদিন প্রচণ্ড জ্বরে বেঁহুশ হয়ে মারা গেলেন তিনি। অনেক ঐতিহাসিকের মতে নেশাগ্রস্ত হয়েই বেঁহুশ হয়েছিলেন।

বাদশা শেরশাহ যখন মাণ্ডুতে এসেছিলেন তখন পিতৃহত্যার জঘন্য অপরাধের কারণে নাসিরুদ্দিনের কবরস্থান এবং কবরে শায়িত তাঁর গলিত মৃতদেহের প্রতিও অনেক অসম্মান দেখিয়েছিলেন, এই মানুষটির প্রতি ঘৃণায়। জাঁহাপনা জাহাঙ্গিরও তাই-ই করেছিলেন।

নাসিরুদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁর তৃতীয় ছেলে দ্বিতীয় মেহমুদ নবাব হলেন। তাঁর পূর্বপুরুষদের মতো তিনিও স্থাপত্যের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। তাঁর আমলেও মাণ্ডুতে অনেক মেহাল ইত্যাদি যোগ হল। মাণ্ডুর রেওয়া-কুণ্ডের কাছে এখন যে মেহালের নাম 'বাজবাহাদুর মেহাল' সেটি তাঁরই বানানো। পদ্মবনে ভরা ছোট্ট এক তালাও বিন্ধ্যপাহাড়ের উপরের সেই রুখু সুন্দর মালভূমি মাণ্ডুতে। সেই তালাওর মধ্যেই মেহাল। সেখান থেকে সোজা চাইলে দেখা যায় রূপমতীর জন্যে বাজবাহাদুরেরই বানিয়ে দেওয়া 'রূপমতী মেহাল'।

দ্বিতীয় মেহমুদের আমলেই বাবার আমল থেকে শুরু হওয়া নিজেদের মধ্যের পারিবারিক কোঁদল এক সাংঘাতিক রূপ নিল। সেই ঝগড়া থামাতে তিনি রাজপুত সর্দার মেদিনী

রায়ের সাহায্য নিলেন। কিন্তু নিঃস্বার্থ সাহায্য এ পৃথিবীতে কে আর কাকে করে? কিছুদিন পর রাজপুত মেদিনী রায় পুরো মাণ্ডুই প্রায় নিজের কবজাতে এনে ফেললেন। ব্যাপার মোটেই সুবিধের নয় বুঝতে পেরে আগেই মেহমুদ পালিয়ে গেলেন গুজরাটে। সেখানে গিয়ে গুজরাটের নবাব দ্বিতীয় মুজাফফর শাহর সাহায্য নিয়ে মাণ্ডুতে ফিরে এসে রাজপুত মেদিনী রায়কে মাণ্ডু থেকে তাড়ালেন।

তাড়ালেন, কিন্তু ইতিহাস পুনরাবৃত্তি করল নিজেকে। গুজরাটের নবাব দ্বিতীয় মুজাফফর শাহর ছেলে বাহাদুর শাহর সঙ্গে মেহমুদের সম্পর্ক খারাপ হয়ে এল। এবং বাহাদুর শাহ পনেরোশো ছাব্বিশ খ্রীস্টাব্দে মালোয়াঁ আক্রমণ করে মেহমুদকে বন্দী করলেন এবং মালোয়াঁকে গুজরাটের তাঁবে নিয়ে এলেন, তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে।

পনেরোশো চৌত্রিশ অবধি মালোয়াঁ গুজরাটের অধীনেই থাকল, যতদিন না বাদশা হুমায়ুঁ মাণ্ডু আক্রমণ করে আবার তা দখল করলেন। তখনকার গুজরাটের রাজা বাহাদুর শা' প্রাণ বাঁচালেন মাণ্ডু থেকে পালিয়ে। সোনগড়ের দিক দিয়ে পালালেন তিনি। সোনগড়ের অত খাড়া উচ্চতা থেকে ঘোড়াগুলোকে সব থেকে আগে নিমারের উপত্যকায় নামিয়ে নিয়েছিলেন। তারপর নিজেরা নেমে নিমার উপত্যকা দিয়ে ঘোড়া চড়েই পালিয়ে যান। মাণ্ডুতে গেলে তোমরা সোনগড়ও নিশ্চয়ই দেখে আসবে। মাণ্ডুর আর সোনগড়ের মধ্যে যোগ

আছে। একটি পাহাড়ের মাধ্যমে। এত শতাব্দী পরও তার অবস্থান এবং দুর্গমতা দেখলে অবাক হয়ে যাবে তোমরা। ওই রকম উঁচু ও খাড়া ঢালহীন মালভূমি থেকে ঘোড়াদের যে কী কায়দায় নামানো সম্ভব তা আজও ভাবলে অবাক হতে হয়। মনে হয়, অসম্ভবকেই সম্ভব করেছিলেন চতুর স্ট্রাটেজিস্ট বাহাদুর শা।

বাহাদুর শাহ তো প্রাণ নিয়ে পালালেন। হুমায়ুঁও মাণ্ডু জয় করে দিল্লি ফিরে গেলেন মালোয়াঁ ছেড়ে। অত বড় বাদশার সময় কোথায় যে, ওখানে পড়ে থাকেবেন দিল্লির মসনদ ছেড়ে ? এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সুযোগ বুঝে আগেকার খলজি বংশের একজন লোক, মাল্লু খাঁ, হুমায়ুঁর সেনাবাহিনীর একজন পুরোনো সেনাপতি, মাণ্ডুর রাজা বনে, তখতে বসে গেলেন।

কী ব্যাপার একবার বোঝো ! চারদিকে খাঁ খাঁ। সব সময়ই খাঁ। খাঁ। খাঁব। খাঁব। খাঁই। খাঁই ! একেবারে যাচ্ছেতাই !

রাজাদের আর নবাবদের গদি বাগানোর হরকৎ বা রকম-সকম অনেকটা মিউজিকাল-চেয়ারের মতোই মনে হচ্ছে। তাই না ?

পুবে নিমার উপত্যকা পেরিয়ে নর্মদা অবধি এবং অন্যদিকে ভিলসা অবধি দখল করে নিয়ে নিজেকে নিজেই নবাব 'কাদির শা' উপাধি দিয়ে মাণ্ডুর তখতে বসে গেলেন পনেরোশো ছত্রিশে মাল্লু খাঁ। পাকা ফোঁড়ার সুড়সুড়-করা মুখেরই মত

নবাবির সুখও কিন্তু বেশিদিন স্থায়ী হয় না। বড়ই মিশ্র-সুখ তা। সুখের সঙ্গে দুঃখেও ভরা। ফোঁড়া একদিন পাকেই, অশেষ যন্ত্রণার পর তা ফাটেও। নবাবীর সুখও গড়িয়ে যায় দুঃখে।

সুখ সইলো না বেশিদিন। মাত্র ছ'বছর পরেই শেরশাহ পনেরোশো বেয়াল্লিশে হালুম-হুলুম করতে করতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এসে নবাব কাদির শাহর উপর। বাঘের সঙ্গে খাটল না তাঁর কোনোই জারিজুরি! মালোয়াঁ ছিনিয়ে নিয়ে শুজ্জাত খাঁকে মালোয়াঁর রাজ্যপাল বানিয়ে দিয়েই ফিরে চলে গেলেন শের শাহ, বাঘেরই মতো ; গোঁফে চুম্‌কুড়ি দিয়ে।

ভিনি, ভিডি, ভিসি।

সুখের বিষয় এইই যে, রাজা-রাজড়া নবাব-ওমরাহ, এম-পি, এম-এল-এদেরও একদিন না একদিন মরতে হয়ই। পনেরোশো চুয়ান্নতে মারা গেলেন শুজ্জাত খাঁ। তবে, মারা গেলেন একজন স্বাধীন নবাবেরই মতো। কারণ, কেউই খবরদারি করতে আসত না তাঁর উপরে ; দিল্লি থেকে অত দূরের মালোয়াঁতে।

তাঁর মৃত্যুর সঙ্গেই নবাবী ঐতিহ্য অনুযায়ী তাঁর তিন ছেলের মধ্যে খেয়োখেয়ি লেগে গেল। অবশেষে তাঁর এক ছেলে, মালিক বায়াজিদ নবাব বনলেন। এবং নবাব বনেই, নিজেকে খেতাব দিলেন 'সুলতান বাজবাহাদুর'!

নবাবরা নিজেরাই নিজেদের এই যখন-খুশি-তখন আকছার

খেতাব যে দেন, এই ব্যাপারটা আমার খুবই মজার লাগে। হয়ত তোমাদেরও লাগে।

আফ্রিকার মাসাই উপজাতির মানুষেরাও এরকম ইচ্ছেমতোই যখন তখন তাদের নিজেদের নাম নিজেরা বদলে দেয়। ধরো, মাসাইদের মধ্যে কারো নাম যদি হয় রাম, তার যদি বেশিদিন 'রাম' থাকতে ইচ্ছে না করে তবে সে খুশিমতো 'শ্যাম' 'গোপাল' বা 'নেপাল' হয়ে যেতে পারে। তাদের সমাজে কেউই ঠেকায় না। ফাস্টোকেলাশ ব্যবস্থা। নাম নিয়ে তুমি যে কোনোক্রমেই বোরড হবে তার জো'টি নেই।

এই অহরহ নাম-বদলের কারণে, পুলিশদের সেখানে মস্ত অসুবিধে হয়। রাম, 'ক' গ্রামে মানুষ খুন করে তিরিশ মাইল দূরের 'খ' গ্রামে গিয়ে 'গোপাল' হয়ে দিব্যি ভালো ছেলে বনে সুখে দিন কাটায়। পুলিশ রামনাম করতে করতে রামকে খুঁজে বেড়ায়।

মাসাইদেরই মতই নবাবেরাও নিজেদের খেতাবের পর খেতাব দিয়ে এবং পুরোনো খেতাবও কখনও-সখনও বদলে দিয়ে নিজেদের মহৎ অথবা নতুন করতে চেষ্টা করেছেন। কী মজা বলো তো! নামটা নতুন হয়ে গেলে, মনে হয় জীবনটাও যেন নতুনই হয়ে গেল। সবই যেন ফিনসে শুরু হলো! নবাবদেরও বোধহয় নিজেদের নতুন খেতাব নিজেরাই দিয়ে নিয়ে নবাবি শুরু করতে অনেক সুবিধে হত। হয়ত, মনে করতেন ; পুরনো জীবনটাকে সাপের খোলসেরই মত ফেলে দিয়ে আবার নতুন

করেই জন্মালেন চিকন, নতুন-গন্ধর শরীর নিয়ে।

পটভূমির ব্যাখ্যায়, মাণ্ডুর নবাব বাজবাহাদুর পর্যন্ত এসে যখন পৌঁছেই গেলাম, তখন ইতিহাসের কচকচি এবার না হয় থাক। চলো, আমরা বাজবাহাদুর আর রূপমতীর মাণ্ডুতেই বরং ফিরে যাই। তাদের দুজনের গল্প শোনাই তোমাদের।

বাজবাহাদুর রাজকার্যের চেয়ে নানারকম শখ ও সুখ নিয়েই বেশি মশগুল ছিলেন। বুদ্ধিমান লোক। জানতেন যে, একটাই জীবন! উপায় ছিল, তাই স্ফূর্তি করে কাটিয়ে দেওয়াই উচিত মনে করলেন। গান বাজনা নাচ শুনে এবং দেখে এবং নানান আমোদ-প্রমোদে দিন কাটাতেন তিনি। তিনি নিজেও ভাল সংগীতজ্ঞ ছিলেন। সুতরাং, অভাবনীয়ভাবে নয়, রানী গণ্ডোয়ানার রানী-দুর্গাবতীর গোঁন্দদের যুদ্ধে বাজবাহাদুরের চরম হার হয়েছিল।

বাহাদুর হয়েও একজন মহিলার কাছে মার খাওয়ার পর থেকেই "হেরো" বাজবাহাদুর মাণ্ডুর বাইরে আর বিশেষ যেতেনই না। পরাজয়ের দুঃখ ভুলতে দিনে দিনে গানবাজনা আর আমোদ-প্রমোদে আরও বেশি করে ডুবিয়ে দিলেন নিজেকে তিনি। তাঁর এইরকম অরক্ষিত ও অপ্রস্তুত অবস্থাতে আগ্রার সুলতান আধম খান, যিনি আকবরের একজন

সেনাপতিও বটেন ; মালোয়াঁ আক্রমণ করলেন। পনেরোশো একষট্টি খ্রীস্টাব্দে।

মাণ্ডু থেকে বাধ্য হয়েই যুদ্ধ করতে নেমে আসতে হলো বাজবাহাদুরকে পনেরো হাজার বিবি আর হাতের-বাজনা আফগানী রাবাব ছেড়ে। কিন্তু শারাংপুরের যুদ্ধে গো-হারা হেরে একেবারে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল সুলতান বাজবাহাদুরের সেনাবাহিনী। বাজবাহাদুর বেগতিক দেখে তখনকার মত বাহাদুরি স্থগিত রেখে, নিজে পালিয়ে প্রাণে বেঁচে গেলেন। কিন্তু আধম খাঁ রৈ রৈ করে "ধার" হয়ে মাণ্ডুতে এসে উঠলেন। হ্রেষারব আর পদাতিক সৈন্যের পায়ের ধুলোয় মাণ্ডুর শান্ত পরিবেশ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

রূপমতীর বড়ই বিপদ। আধম খাঁ অনেক চেষ্টা এবং ছলচাতুরিও কয়ে ছিলেন রূপমতীকে বিয়ে করার জন্যে। কিন্তু রূপসী বন্দিনী রূপমতী তাঁকে বারবারই ফিরিয়ে দিলেন। শেষে যখন দেখলেন যে, নিজের মান-ইজ্জত আর বাঁচানো যাবে না, তখন তিনি আত্মাহুতি দিলেন।

সবই শেষ হয়ে গেল। রাগ-রাগিনী, তাঁর আশ্চর্য রূপ, তাঁর দিঘল চোখদুটি, কোমর-ছাপানো চিকন সুগন্ধি চুল, সব, তারই সঙ্গে মুছে গেল তাঁর গলার অপরূপ মেঘমল্লারের সব আলাপ, তান ; বিস্তার। সব কথাতে পরে আবার আসব।

শারাংপুরে একটি ভাঙা কবর আছে। সেখানে লেখা আছে যে ওটি নাকি রূপমতীর কবর। কিন্তু ঐতিহাসিকরা সন্দেহ প্রকাশ

করেন। বলেন, এ রূপমতী অন্য কোনো রূপমতী হবেন। মাণ্ডুর পদ্মবালা একজনই। রূপবতী ত অনেক নারীই ছিলেন এবং এখনও আছেনও পৃথিবীতে কিন্তু রূপমতী দুজন হননি।

রূপমতী সম্বন্ধে কোন কোন ঐতিহাসিক, যেমন ফিরিস্তা ; বলেছেন যে, তিনি বিখ্যাত বাঈজি ছিলেন। শারাংপুরের মেয়ে তিনি।

মাসির-উল-উমরা এবং আহমদ-উল-উমারির লেখকরা বলেছেন যে, তিনি তওয়ায়েফ ছিলেন। মানে, গানেওয়ালি, নাচেওয়ালি।

নিজামুদ্দিন আহমদ, তাবাকুয়াত-ই-আকবরির লেখক কিন্তু রূপমতীকে বাজবাহাদুরের স্ত্রী বলেই উল্লেখ করেছেন। তাঁর মূল পরিচয় সম্বন্ধে যে-ঐতিহাসিক যাই-ই বলুন না কেন, তাঁর রূপ ও গুণ, রাগসঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁর অশেষ জ্ঞান, বাজবাহাদুরের প্রতি তাঁর ভালবাসা এবং তাঁর সতীত্বর প্রশংসা কিন্তু করেছেন প্রত্যেকেই।

কোনো কোনো ঐতিহাসিক এও বলেছেন যে, রূপমতী হিন্দীতে ভালো কবিতা লিখতেন। খুব সাহসী শিকারীও ছিলেন তিনি এবং দারুণ অশ্বারোহীও। নিজে ঘোড়া চালিয়ে জঙ্গলে গিয়ে বাঘ মারতেন। তখন মাণ্ডুর চারদিকেই ঘন জঙ্গল ছিলো। বাঘ ত ছিলোই! তাঁর অসীম সাহসের কথা তাঁরা প্রত্যেকেই বারবার বলেছেন। শারীরিক সাহসের পরিচয়

দিয়েছেন তিনি শিকারে। আর মনের সাহসের পরিচয়, আধম খাঁর হাতে বন্দিনী হয়ে থাকার সময়ে। শারীরিক সাহস ত শস্তা সাহস, যে-কেউই তা দেখাতে পারে। গুণ্ডা বদমাসদেরও শারীরিক সাহস থাকে। কিন্তু মনের সাহসে যে সাহসী, সেই-ই তো সত্যিকারের সাহসী! তাই না?

বাজবাহাদুরের শারাংপুর থেকে মাইল-কুড়ি দূরে আকবরের সেনাপতি আধম খাঁর সঙ্গে সেই সাংঘাতিক যুদ্ধে যে নিজেই হারলেন তাই-ই নয়, মালোয়াঁর বহু সৈন্য মারা গেল সেই যুদ্ধে। পনেরোশো একষট্টির সাতাশে মার্চে সেই যুদ্ধ হয়েছিল। খান্দেশের দিকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচালেন বাজবাহাদুর।

খারাপ লাগে এই কথা মনে করলে যে, কেমন পুরুষমানুষ ছিলেন তিনি? এত নীচ ও ইতর কোনো নবাব্ কি হতে পারেন? নিজের প্রাণটি নিয়েই পালিয়ে গেলেন! রূপমতীর কথা একবারও না ভেবে?

বাজবাহাদুরের সব ধনরত্ন, সব সম্পত্তি, তার মধ্যে রূপমতীও পড়েন, আয়ত্তে এল আধম খাঁর। বাজবাহাদুর মাণ্ডু ছেড়ে শারাংপুরে যুদ্ধে যাবার আগে তাঁর একজন বিশ্বস্ত অনুচরকে বলে গেছিলেন যে, যদি তিনি যুদ্ধে হেরে যান তবে তাঁর হারেমের সব বিবিদের এবং বিভিন্ন দেশী অসংখ্য মেয়েদেরও যেন মেরে ফেলা হয় ; মুঘল সৈন্যরা মাণ্ডুতে এসে পৌঁছবার আগেই। নইলে নবাব-বে- ইজ্জৎ হবেন।

এও বা কেমন কথা হল? "হেরো" নবারের 'ইজ্জৎ'-এর দাম দিতে হবে অসংখ্য ফুলের মত নারীদের জীবন দিয়ে? এ যে কোন ধরনের বাহাদুরি তা সে বাজবাহাদুরই বলতে পারতেন।

তাঁর হারের খবর পাওয়ামাত্রই তাঁর আজ্ঞা, তাঁর আস্থাভাজন অনুচরেরা নাকি পালনও করেছিলেন। প্রায় সব নারীদেরই জাহাজ-মেহাল এবং অন্যত্র যেখানে যেখানে তাঁরা থাকতেন সেখানে সেখানেই নাকি মেরে ফেলা হয়। অনেকে আহতও হয়ে রইলেন; প্রাণে মরলেন না। তাঁদের দোষ যে, তাঁরা নারী, ভোগ্যবস্তু, নবাবের ব্যক্তিগত সম্পত্তি!

রূপমতীও নাকি সাংঘাতিকভাবে আহত হয়েছিলেন।

আধম খাঁ যাঁদেরই পেলেন তাঁদেরই ধরে নিয়ে গেলেন। এবং বিশেষ অনুচর পাঠালেন রূপমতীকেও ধরে তাঁর কাছে আনতে। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে রূপমতীকে নাকি প্রথমে তাঁর গুরু শেখ উমারের কাছে পাঠানো হয়েছিল হোশাঙ্গাবাদে। সেখানেও আধম খাঁ প্রায়ই গিয়ে রূপমতীর মন জয় করার চেষ্টা করতেন।

সেখানেই তাঁর ক্ষতগুলির চিকিৎসা হয় এবং তিনি সুস্থও হয়ে ওঠেন। কিন্তু ক্ষত যতদিন ছিল; অজুহাতও ছিলো। যখন আর কোনো অজুহাতই রইল না, তখন আধম খাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটল।

রূপমতী অনেক ভেবে শেষে সব ভাবনাকে তাঁর ওড়নার মত

ফেলে দিয়ে একদিন কর্পূর, জাফরান আর আতরমেশানো জলে ভাল করে স্নান করে সুন্দর করে সেজে নিজে হাতে বিষ খেলেন। নিজের জীবন নিজের হাতে শেষ করলেন হিন্দুস্তাঁর সেরা সুন্দরী রূপমতী। হিন্দু নারীর সতীত্ব রক্ষা করার জন্যে। পনেরোশো একষট্টির সাতাশে এপ্রিল বাদশা আকবর আগ্রা ছেড়ে শারাংপুরে এসে পৌছলেন মে মাসের তেরো তারিখে। মালোয়াঁর সুষ্ঠু প্রশাসনের সব বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ করেই তিনি আবার আগ্রাতেই ফিরে গেলেন। এবং আধম খাঁকেও তারপর আগ্রাতে ডেকে পাঠালেন। আধম খাঁর বদলে পীর মুহাম্মদ খাঁকে মালোয়াঁর সুবেদার করে পাঠালেন বাদশা আকবর। সেই সময়ে অজ্ঞাতবাস থেকে শেষবারের মত নবাব বাজবাহাদুর তাঁর ছত্রভঙ্গ বাহিনীকে একত্রিত করে আক্রমণ করেন পীর মুহাম্মদ খাঁকে। এবং আশ্চর্যের বিষয়, মালোয়াঁ পুনরধিকারও করেন নাকি।

বাদশা আকবর তখন আবদুল্লা খাঁ উজবেগ আর মুনিম খাঁকে পাঠালেন আগ্রা থেকে হঠাৎ-জেতা "হেরো" বাজবাহাদুরকে ভাল করে শেখানো-পড়ানোর জন্যে।

বাজবাহাদুরের যুদ্ধের কপাল কখনই ভাল ছিল না। উজবেগ খাঁ আর মুনিম খাঁ এর সঙ্গে প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করলেন তিনি। এবং পরাজিত হলেন। আবারও ছত্রভঙ্গ হল তাঁর সেনাবাহিনী। আবারও হেরে, জঙ্গলে পালিয়ে গেলেন 'হেরো' নবাব। মালোয়াঁ আবারও মোগলদের অধীনে এল, আফগান

বাজবাহাদুরের শেষ যুদ্ধে পরাজয়ের পর।

অনেকে বলেন, তারপর বাজবাহাদুর নানা জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে শেষে বাদশা আকবরেরই কাছে নাকি পনেরোশো সত্তরে গিয়ে আশ্রয় নেন। আকবরের দরবারের সংগীতজ্ঞদের মধ্যে, তখন মিঞা তানসেনেরই মতো বাজবাহাদুরও দরবারের একজন সংগীতজ্ঞ, একজন বিশিষ্ট গায়ক হিসেবে যোগ দেন। এবং আগ্রাতেই পনেরোশো পঁচানব্বুইতে নাকি মৃত্যু হয় তাঁর।

নিজের প্রিয় স্ত্রী এবং চোখের মণিকে আকবরের সেনাপতির হাতে ছেড়ে এসে বাজবাহাদুর নিজে বাদশাহ আকবরেরই কাছে আশ্রয় নেন।

এই নইলে বীর!

তবে, মানুষের জীবন বড়ই বৈচিত্র্যের। নদীরই মত তার চাল। কোথায় যে এ পাড় ভাঙে আর কোথায় ফেলে চর, আর কেনই বা তার চলা, সেসব বোঝাও ভারী মুশকিল।

সাম্প্রতিক অতীতের ঐতিহাসিকরা অবশ্য অন্য কথা বলেন। বলেন যে, রূপমতীর মৃত্যু হয়েছিল যেমন শারাংপুরে, বাজবাহাদুরেরও নাকি তাই-ই। তাঁদের দুজনকেই একই সঙ্গে কবর দেওয়া হয়েছিল পাশাপাশি, শারাংপুরের এক মস্ত তালাওয়ের মধ্যের এক ছোট্ট দ্বীপে। এখন এই কবর নাকি ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছে।

আমাদের মন কিন্তু এই দ্বিতীয় কাহিনীটিকেই মানতে চায়।

তাই না?

যে-রূপমতীকে ফেলে বাজবাহাদুর পালালেন, যে-রূপমতী আকবরের সেনাপতি আধম খাঁর অত্যাচারের ভয়ে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করলেন ; সেই রূপমতীরই চোখের মণি স্বয়ং বাজবাহাদুরই আকবরের দরবারে গিয়ে আশ্রয় নিলেন তাঁর দরবারি গায়ক হিসেবে, একথা মেনে নিতে বড়ই লজ্জা করে আমাদের। বাজবাহাদুরকে আর ভালোও লাগে না। ঘেন্না হয় তার প্রতি। কেমন পুরুষ তিনি? ছিঃ!

মাণ্ডুতে যদি তোমরা যাও, তবে বর্ষাকালে গেলেই সব চেয়ে ভাল হয়। মাণ্ডুর বর্ষার রূপের খ্যাতি বাদশা আকবর এবং জাঁহাপনা জাহাঙ্গির বারবারই করেছেন। দীঘিতে দীঘিতে তখন কানায় কানায় জল। পদ্মপাতার মধ্যে জলছড়া দিয়ে দৌড়ে-যাওয়া ছিপছিপে জলপিপিদের আর ডাহুকদের খেলা। পাহাড়ে পাহাড়ে ঝরণার কুলকুল। নিমারের উপত্যকা তখন সবুজেরই সংজ্ঞা যেন। চাপ-চাপ ঘাস। হিমেল, মিষ্টি আমেজ চারদিকে।

এক সময়ে মাণ্ডুর জাহাজ মেহালের চাতালে, চবুতরায়, খিলানে, গম্বুজে, ঝরোকাতে লক্ষ লক্ষ প্রদীপ জ্বলত। একতলা-দোতলার সুইমিং-পুলের সুগন্ধি জলে খেলা করত পৃথিবীর সেরা সব সুন্দরীরা। রাতের বেলায় দূর থেকে মুঞ্জ তালাওয়ের পদ্মবনে-ঢাকা জলরাশির উপর আলোর মালায় সেজে থাকা জাহাজ-মেহালকে দেখে সত্যিই মনে হত

কোনো আনন্দের জাহাজই যেন ভেসে চলেছে কোনো দেবলোকের পানে। রাত গভীর হলে রবাব আর সারেঙ্গির সঙ্গে রূপমতী মেঘমল্লারে গম্ভীর বিধুর আলাপ করতেন। নানা বাজনার আর নূপুরের শব্দ আর নিক্কন-তোলা কণ্ঠস্বরের ফোয়ারা উঠত দমকে দমকে। হাসি, গান, নাচ কত কী!

বাজবাহাদুর, রূপমতীর পাশে বসে থাকতেন পারস্যদেশী গালচেতে, মখমলমোড়া তাকিয়াতে হেলান দিয়ে। বাজবাহাদুরের আলবোলার শুবানি তামাকের গন্ধ, বর্ষা রাতের মাগুর গায়ের গন্ধ, আর লাজুক রূপমতীর লাজুক শরীরের সুগন্ধের সঙ্গে মেঘমল্লারের আলাপ মিশে গিয়ে তখন জাহাজ মেহাল এক মেঘযান হয়ে আভাসিত হত মেঘ-মেদুর শ্রাবণ আকাশে।

বর্ষায় যদি নাও পারো যেতে তোমরা, তবে যে-কোনো সময়েই যেও। যা পাবে না তখন; তা তোমাদের কল্পনা দিয়েই ভরিয়ে নিও। ইতিহাসে তো কিছু তথ্য, কিছু ঘটনা, কিছু সন তারিখই থাকে মাত্র। বাকিটা, যে ইতিহাস পড়তে জানে, ভালোবাসে; তাকে কল্পনা দিয়েই ভরিয়ে নিতে হয়। মানুষকে বিধাতা কল্পনার মতো এমন দামী ঐশ্বর্য আর কী-ই বা দিয়েছেন বলো?

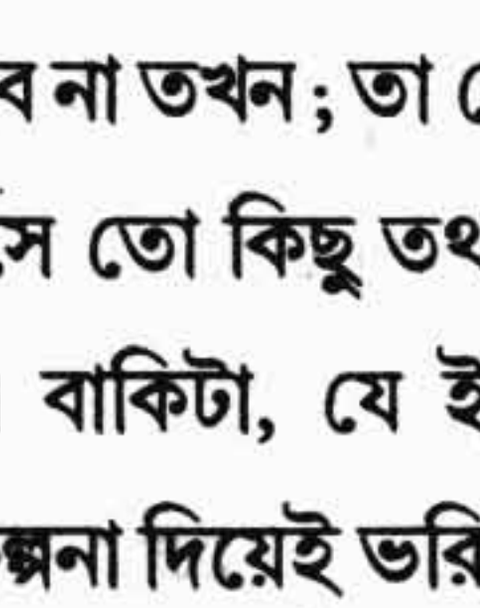

আহমেদ-উল-উমরি, তুর্কোমান, মালোয়াঁর অনেক জায়গাতেই গেছিলেন। তিনি বাজবাহাদুর আর রূপমতী সম্বন্ধে আলাদা একটি বইও লিখে গেছিলেন। যে বই প্রকাশিত হয়েছিল পনেরোশো নিরানব্বই খ্রীস্টাব্দে। তাঁর বইয়ের নাম দিয়েছিলেন তিনি "আশ্চর্য এক বিশ্বস্ততার কাহিনী।"

অনেক বিদেশী পর্যটকরাই তো কোথায় মালোয়াঁ আর কোথায় মাণ্ডু তা জানতেনই না। অনেকে নিজের চোখে দেখেনওনি। মোটামুটি শুনেছিলেন যে, হিন্দুস্তাঁর মধ্যভাগে বিন্ধ্যপর্বতের পিছনদিকের এক উঁচু মালভূমিতে মালোয়াঁ বলে এক রাজ্য ছিলো। মালোয়াঁ দেখে-আসা তখনকার পর্যটকেরা হিন্দুস্তাঁ সম্বন্ধে বলতে গেলেই বলতেন, যেমন এখনও অনেকেই বলেন ; "বেনারসের ভোর, অযোধ্যার সন্ধ্যে ; আর মালোয়াঁর রাত।" সেই মালোয়াঁরই রাজধানী মাণ্ডু ছিল সব

দুর্গের সেরা দুর্গ। রেওয়া নদীর উপত্যকা থেকে সোজা কয়েক হাজার ফিট উঠে-যাওয়া মালভূমির উপর থেকে মাণ্ডু দুর্গটি যেন ঝুলে থাকত। তখনকার মানুষ যে-নদীকে রেওয়া বলে ডাকতেন, আজ তারই নাম নর্মদা। এবং রেওয়ার সেই উপত্যকাই নিমারের সমতলভূমি। তখন তা ছিল ঘন জঙ্গলাকীর্ণ।

রূপমতী শুধু গাইয়েই ছিলেন না, তুর্কোমান-এর মতে, তিনি খুব ভাল কবিও ছিলেন। তাঁর গান এবং কাব্য-প্রতিভায় বাজবাহাদুর এমনই মুগ্ধ ছিলেন যে, রূপমতীর অঙ্গুলি হেলনেই রাজ্যের যা কিছু কাজকর্ম হত মন্ত্রীদের মাধ্যমে। বাজবাহাদুর এই কঠিন, বাস্তব, পরাজয়ের পৃথিবী থেকে পালিয়ে গিয়ে যেন শুধু রূপমতীর গানবাজনার জগতেই বাস করতেন, বেঁচে থাকতেন। কী আনন্দ! কী সুখ! কোনো মানুষকে যদি হারিয়েই যেতে হয় আদৌ, যদি পালিয়েই যেতে হয়, তবে এমন গান-বাজনার জগতেই হারিয়ে যাওয়া উচিত। হারের মধ্যে এ জগতে কোনো লজ্জা নেই। কিছু পরাজয় হয়ত থাকেই, যেমন পরাজয়ের কথা বাজবাহাদুর নিজে নিশ্চিতভাবেই জেনেছিলেন, যে-পরাজয়ের পটভূমিতে জয়কে বড় ম্লান বলে মনে হয়।

আহমেদ-উল-উমরি, তুর্কোমান যা লিখেছেন, তাতে জানা যায় যে, আধম খাঁ মাণ্ডুতে এসে রূপমতীকে পাবার চেষ্টাতে যখন সবরকম উপায়ই অবলম্বন করছেন সেই সময় রূপমতী

ফুলওয়ালি সেজে মাণ্ডু থেকে পালিয়ে পাহাড়ে নেমে শারাংপুরের দিকে এগোতে লাগলেন। যেখানে তাঁর জন্ম। যেখানে কেটেছে তাঁর ছেলেবেলা। যেখানে আত্মীয়-পরিজন; সংগীতগুরু।

প্রায় পৌঁছেও গেছিলেন। শারাংপুর থেকে তিনি যখন আর মাত্র কুড়ি মাইল মতো দূরে ঠিক তখনই আধম খাঁর লোকজন, যারা খবরটা জানাজানি হওয়ামাত্রই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল রূপমতীকে ধরে আনার জন্যে ; ধরে ফেলেছিল রূপমতীকে।

দ্বিতীয়বার মোগল আধম খাঁর খপ্পরে পড়লেন রূপমতী। তাঁকে ধরে আধম খাঁর কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। তখন সেই মহীয়সী নারী, যাঁর চোখের মণি ছিলেন বাজবাহাদুর, শুধুই বাজবাহাদুর ; মোগল সেনাপতি আধম খাঁকে বললেন, 'আমি আপনার এই কার্যকলাপে বড়ই ক্লান্ত, বিরক্ত। আমাকে পাওয়ার আশা কোনোদিনও পুরবে না আপনার।'

আধম খাঁ বললেন, ঠিক আছে। শুধু কথায় যখন কাজ হবে না, তখন অন্য উপায়ই দেখছি।

রূপমতী যখন দেখলেন যে, পালাবার কোনো পথই আর খোলা নেই, বাঁচারও আশা নেই কোনো আধম খাঁর হাত থেকে ; তখন তিনদিন সময় চেয়ে নিলেন। যদিও আধম খাঁর হারেমেই তখনকার মত থাকতে বাধ্য হলেন তিনি।

হারেম থেকে আধম খাঁকে তিনি শ্বেতপাখির পালকের কলম,

চীনদেশী কালিতে ডুবিয়ে লিখে পাঠালেন ঃ "বিজয়ী সেনাপতি, আমি তো বিজিতা ; আমার তো কোনো উপায়ই নেই আপনার আদেশ অমান্য করার ; কিন্তু তবুও জেনে রাখুন যে, আমার জীবনের একমাত্র গর্ব, আমার সম্মান, বাজবাহাদুরের সখী হিসেবেই। এ ছাড়া আমার অন্য কোনো পরিচয় ছিলো না, নেই এবং থাকবেও না।"

এই বার্তা যখন আধম খাঁর হাতে পড়ল তখন বীর এবং রসিক সেনাপতি লিখে পাঠালেন, "আমি সাত রাজ্য জয় করেও হেরে গেলাম আপনার কাছে রূপমতী ! জয়ী আপনিই ! আমি আমার সব ধন-সম্পত্তি, মান-সম্মান ধুলোয় লুটিয়ে দেব, মিটিয়ে দেব মৃত্যুর পরে আমার বেহেস্তে যাওয়ার সব সাধ, ছুঁড়ে ফেলব অন্য যা-কিছু কামনা-বাসনা, আমার রণসাজ ; আপনি শুধু আমার হোন, হাসিমুখে ; খুশিমনে। "না" করবেন না আপনি।"

ভাল সেনাপতি হতেও তো গুণ লাগে। আধম খাঁর এই চিঠিটি কিন্তু আমার চোখে, মানুষটিকে অনেকই বড় করে দেয়। যে মানুষ, মান-সম্মান ক্ষমতা বল সবই এক লহমায় ছেড়ে দিতে রাজী থাকেন, তা যে কারণের জন্যেই ছাড়ুন না কেন, তাঁকে বড় বলে যে মানতেই হয় ! ক্ষমতার মত আঠা যে ইতিহাসে আর নেই, নেই ক্ষমতার লোভের মত এত তীব্র লোভও। সেই ক্ষমতা একজন নারীর জন্যে ছুঁড়ে যে ফেলতে পারেন তিনি নিশ্চয়ই খাঁটি মানুষ। তাঁর ভালোবাসাটা আদৌ মিথ্যে

নয়।

আধম খাঁ রূপমতীর জন্য পাগলই হয়ে গেলেন। তখন তাকে দেখে কে বলবে যে, তিনিই এত বিখ্যাত একজন সেনাপতি। পাগলের মতো একদিন তিনি শুজ্জাত খানকে হুকুম করলেন মেহাল সাজাতে। আলোয়, ফুলে ফুলে। হুকুম করলেন, গন্ধ ওড়াতে ; আতর ছড়াতে। আমির-ওমরাহদের কাছে সেই খুশির রাতের ভোজের দাওয়াত এর 'খত'ও পাঠিয়ে দিলেন তিনি। মিলনের রাতের। রূপমতীকে তিনি গ্রহণ করবেন সেই রাতে, অথবা রূপমতী তাঁকে।

রাত অনেক হলো। রূপমতী এলেন না। মাঝ-রাতে বাজবাহাদুরের রাজসভার সবচেয়ে বড় গাইয়ে রাইচাঁদকে গাইতে হুকুম করলেন আধম খাঁ। রাইচাঁদ এবং অন্যান্যরা আফগানি রাবাবের তারে আঙুল ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে তাঁদের গানের মধ্যে দিয়ে যেন মাণ্ডুর জখমি হৃদয়ের দিল-দর্দি কান্নাই ছড়িয়ে দিতে লাগলেন রাতের মাণ্ডুতে, রাতেরই জন্য বিখ্যাত সেই মালোয়াঁর রাজধানীতে।

গান ওঁরা গাইছিলেন মালবী ভাষায়। সুরে ভরপুর হয়ে বলছিলেন : ওগো অত্যাচারী সেনাপতি ! তোমার দিন ঘনিয়ে এসেছে। এই শান্তির আর খুশির আর আনন্দের শহর তোমার এই অত্যাচার আর বেশিদিন সহ্য করবে না। আর কতদিন তুমি আমাদের এমনি করে কষ্ট দেবে? সব কষ্টেরই শেষ থাকে যে, একথা মনে রেখো।

গান যখন শেষ হয়ে এল, রাবাবের উপরে রাখা আঙুলগুলি থেমে গেল, সুরের রেশগুলি মুঞ্জ তালাও-এর পদ্মবনের গভীরের নিটোল জলের সঙ্গে জলেরই মতো মিশে গেল, দ্রব হয়ে ; তখন অন্য ভাষা-ভাষী অধম খাঁ সেই গানের মানে বুঝতে পারলেন আস্তে আস্তে। রাইচাঁদের উপরেই গিয়ে সব দোষ পড়ল। খুশির আর খুশবুর বেহেস্ত ভয় আর আতঙ্কের দোজখে পরিণত হল। রাইচাঁদকে দেখে নেবেন বলে শাসালেন তিনি। রাইচাঁদকে উপযুক্ত সময়ে যথোপযুক্ত শাস্তি দেবেন বলে ঠিক করলেন।

ভোরের আলো ফুটল রেওয়ার উপত্যকায়, পুবে। আধম খাঁ দাঁতে দাঁত চেপে ঠিক করলেন রূপমতীর সঙ্গে একটা হেস্তনেস্ত করবেন সেদিনই। শেষ হেস্তনেস্ত।

রূপমতীর রাতও কম কষ্টে, কম চোখের জলে কাটেনি। তিনি বুঝেছিলেন যে বাজবাহাদুরের সঙ্গে দেখা তাঁর আর এ-জন্মে হবে না। আধম খাঁ এবার যে অন্যরকম ব্যবহার করবেন তা তিনি বুঝতেই পেরেছিলেন। তাঁর ভাগ্য আর সেই ভয়ার্ত-বেলার বিধাতার পায়ে নিজেকে নিবেদন করা ছাড়া আর কোনোই উপায় দেখলেন না তিনি। সে রাতের ভোজের পরই আধম খাঁ তাঁর প্রাসাদকে রূপমতীকে গ্রহণের জন্যে তৈরী করতে বলে আদেশ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, পরম লগন এসেছে। কোনো ত্রুটি যেন না থাকে বন্দোবস্তে। হিন্দু নারীকে জোর করে কী ভাবে পেতে হয় তা মোগল সেনাপতি

ভালভাবেই জানেন।

রূপমতী যত্নভরে স্নান সেরে সখীদের বললেন, তাঁকে বাজবাহাদুরের সঙ্গে যেদিন তাঁর বিয়ে হয়েছিলো, সেই বিয়ের সাজেই সাজিয়ে দিতে, হুবহু তেমনি করেই। সেই পোশাক বাজবাহাদুরই তাঁকে দিয়েছিলেন। সেজেগুজে, সুগন্ধি, উজলা হয়ে, হাতে তিনি তাঁর বীণা তুলে নিলেন। এবং এমন সব বিধুর গান, তাঁর শেষের গান গাইতে লাগলেন যে, যারা তা শুনল তাদের বুক ভেঙে যেতে লাগল। গাইয়ে ছিলেন রূপমতী ; তাই-ই বোধহয় শেষের গানের রেশ নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন দুকান ভরেই, চিরদিনের জন্যে চলে যাওয়ার আগে।

গান গাওয়া শেষ হলে তাঁর শোবার ঘরে গিয়ে হিরেচুর বিষ খেয়ে ফেললেন তিনি। চকিতে এক মধুর-বিধুর হাসি ছড়িয়ে গেলো মুখে। এবার নিশ্চয়ই দেখা হবে বাজবাহাদুরের সঙ্গে। আসীকের সঙ্গে মাশুকের।

আধম খাঁ ততক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছেন রূপমতীর ঘরের দরজায়। ছায়া পড়েছে তাঁর দীর্ঘ শরীরের, বারান্দার মেঝেতে। পর্দার ঝালরের ওপাশে দাঁড়িয়ে ঈজাজৎ চাইলেন তিনি রূপবতীর ঘরে ঢোকবার। কোনো সাড়া নেই। আবারো ঈজাজৎ চাইলেন ভিতরে ঢোকার।

ভেতর থেকে সাড়াশব্দ না পেয়ে আধম খাঁ বিনা অনুমতিতেই যখন ঢুকে এলেন, তখন দেখলেন, রূপমতী তার কালো চুল আর সব রূপ নিয়ে এলিয়ে পড়ে আছেন বিছানায়। শরীরটিই

আছে শুধু। যে রূপমতীর পদক্ষেপে, চাউনিতে, গলার স্বরে, অঙ্গুলিহেলনে, পাহাড়-নদী, মেঘ-সমুদ্রও চমকে উঠত, জেহাজ মেহালের সেই রূপমতী তখন অন্য এক কিমতি-মেহালের দিকে তারা-ভরা আকাশের মাঠে হাঁটা দিয়েছেন। আমির খুসরু বলেছিলেন যে, "আমি যখন থাকব না পৃথিবীতে তখন এই পৃথিবীর মাটিতে আমার কবরটি কোথায় আছে তা খুঁজতে যেও না তোমরা। দোহাই তোমাদের ! কারণ, প্রতিটি বিশ্বস্ত হৃদয়ই আমার স্মৃতিফলক।"

এতো রূপমতীরই কথা !

মাণ্ডুতে কিন্তু একবার যেও তোমরা। যে করেই হোক, যেও। প্লেনে যদি যাও, তবে যেতে পারো ইন্দোর। বম্বে অথবা দিল্লি থেকে। ট্রেনেও যেতে পারো। মোদ্দা কথা, যাতে করেই যাও, গোরুর গাড়িতে বা পায়ে হেঁটে হলেও ; লক্ষ্মীটি একবার যেও।

মাণ্ডু না দেখলে, ভারতবর্ষের এক বিশেষ 'আশ্চর্য'ই অদেখা থাকবে তোমাদের। সেখানে গিয়ে দাঁড়ালে রূপমতী আর বাজবাহাদুরের অস্তিত্ব অনুভব করবে তোমরা। ভর দুপুরের রুখু হাওয়ায় আমলতাসের পাতার কাঁপুনিতে অনেকের মধ্যে থেকেও এক দারুণ অনুভূতিতে ছমছম করে উঠবে তোমার শরীর, সেই ক্ষুধিত-পাষাণের সাক্ষী হয়ে।